অন্তরার বাবা

মফিজউদ্দিন সাহেব নির্বিরোধী মানুষ। প্রাইভেট ব্যাংকে ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগে কাজ করেন। ঢাকার মালিবাগে ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকেন। চিপা গলির ভেতর ফ্ল্যাট। গাড়ি ঢোকে না বলে বেশ সস্তা। চার রুমের বাইশ শ স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট। ভাড়া তিন হাজার টাকা। মফিজউদ্দিন সাহেবের সংসার ছোট। স্ত্রী, দুই মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। কানাডায় স্বামীর সঙ্গে থাকে। ছোট মেয়েটিরও বিয়ের কথা হচ্ছে। পাত্র পক্ষ মেয়ে দেখে গেছে। ফাইন্যাল কিছু না বললেও মেয়ে যে তাদের খুব পছন্দ এটা বোঝা যাচ্ছে। ছেলেটাও পড়াশোনায় ভালো। জুলাই মাসে অনার্স পরীক্ষা দেবে। পাস করে বের হয়ে কোথাও চাকরি না পেলে ব্যাংকে চাকরি হবেই। মফিজউদ্দিন সাহেব তাঁর ব্যাংকের এমডি সাহেবকে বলে রেখেছেন।

কাজেই মফিজউদ্দিন সাহেবকে মোটামুটি সফল এবং সুখী মানুষ বলা যেতে পারে। তাঁর স্ত্রী-ভাগ্যও ভালো। রেহানা অতি শান্ত স্বভাবের মেয়ে। স্বামীর সঙ্গে তার যে ঝগড়াটগড়া হয় না তা না, মাঝেমধ্যে হয়। তবে তখনো মফিজ সাহেবের কী দরকার কী দরকার না তার দিকে কঠিন নজর থাকে।

ব্যাংক থেকে ফিরতে মফিজ সাহেবের রোজই সন্ধ্যা সাতটা-আটটা বেজে যায়। তিনি ফিরেই গরম পানি দিয়ে গোসল করেন। গোসল সেরেই খেতে বসেন। খাওয়া শেষ করে মিনিট দশেক চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন, তারপর এসে টিভির সামনে বসেন। নাটক থাকলে নাটক দেখেন। নাটক না থাকলে ভিসিপিতে হিন্দি ছবি দেখেন। পুরোনো ছবি দুবার-তিনবার করে দেখতেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই। তবে পুরোনো ছবি যেন তাঁকে দেখতে না হয় রেহানার সেদিকেও নজর আছে। বাসায় কেউ না থাকলে তিনি নিজেই ভিডিও ক্লাব থেকে ছবি নিয়ে আসেন। হিন্দি ছবি দেখার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই, তবু স্বামীকে খুশি করার জন্যে

তিনি বলেন—নাচ-গান আসলে আমাকে ডাক দিও তো। তোমার সঙ্গে বসে দেখব। মফিজ সাহেব সুবোধ স্বামীর মতো নাচ-গানের জায়গা এলে স্ত্রীকে ডাকেন।

স্বামী-স্ত্রীর সাংসারিক কথাবার্তা ছবি দেখার সময়ই হয়। কারণ মফিজ সাহেব ছবি শেষ করেই ঘুমাতে যান। তাঁকে খুব ভোরে উঠতে হয়। প্রাইভেট ব্যাংক, ন'টা থেকে ব্যাংকিং আওয়ার।

মফিজ সাহেবের জীবনযাত্রা এভাবেই চলছিল। এক বুধবারে সামান্য ব্যতিক্রম হল। তিনি পলিথিনের এক পোঁটলা নিয়ে অফিস থেকে ফিরে যথারীতি গোসল করতে গেলেন। গোসলের মাঝখানে রেহানা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, পোঁটলার ভেতর কাপড় কিসের?

মফিজ সাহেব বললেন, আমার কাপড়।

'তোমার কী কাপড়?'

'কিনলাম আর কি?'

'কিনবে তো বটেই। বিনা টাকায় তোমাকে কে কাপড় দিবে? কিসের কাপড়?'

'কাফনের কাপড়।'

'কাফনের কাপড় মানে কী?'

মফিজ সাহেব জবাব দিলেন না। মাথায় পানি ঢালতে লাগলেন। রেহানা বললেন, জবাব দিচ্ছ না কেন কাফনের কাপড় মানে কী? কার কাফনের কাপড়? তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কি মারা গেছ নাকি যে তোমার কাফনের কাপড়? গোসলটা একটু বন্ধ রেখে কথার জবাব দাও তো।

'আমার এক কলিগ হজ করতে গিয়েছিলেন। তাকে আনতে বলেছিলাম।'

'মক্কা থেকে তোমার জন্যে কাফনের কাপড় আনতে বলেছ? কেন দেশে সাদা কাপড় পাওয়া যায় না?'

'কাবা শরিফ ছুঁয়ায়ে এনেছে।'

'কাবা শরিফ ছুঁয়ায়ে তোমার জন্যে কাফনের কাপড় আনতে হবে কেন?'

মফিজ সাহেব গোসল শেষ করে বের হলেন। শান্ত গলায় বললেন, ভাত দাও।

'ভাত দাও মানে? তুমি আগে বল কাফনের কাপড় কী মনে করে আনালে?'

মফিজ সাহেব জবাব দিলেন না। খাবার টেবিলের দিকে রওনা হলেন।

বিয়ের কথা ঠিকঠাক হবার পর কোন এক বিচিত্র কারণে মেয়েরা বাবার দিকে চলে আসে। অতিরিক্ত মমতা দেখায়। খানিকটা আহ্লাদীও করে। মফিজউদ্দিন সাহেবের মেয়ে অন্তরার ভেতরও এই ব্যাপার হয়েছে। সে তার ঘরে বসে ছিল। মায়ের চেঁচামেচি শুনে বিরক্ত মুখে বলল, এ রকম করছ কেন মা?

রেহানা বললেন, কী করছি? তোর বাবা কী করেছে শুনতে পাস নি? কাফনের কাপড় নিয়ে এসেছে।

'কী হয়েছে তাতে? অনেকেই আনে। শুধু শুধু চেঁচিও না তো মা। একটা মানুষ সারা দিন অফিস করে এসেছে তাকে তুমি রেস্ট দেবে না? চিৎকার করে মাথার পোকা নড়িয়ে দিচ্ছ।'

'এই কাফনের কাপড় আমি কিন্তু ঘরে রাখব না।'

'আচ্ছা রেখো না। এখন দয়া করে চিৎকার থামাও। ভাত খাবার পর বাবা মুভি দেখবে—নতুন কিছু এনেছ? না আনলে স্লিপ দিয়ে কাজের মেয়েটাকে পাঠাও। বেচারা রোজ পুরোনো মুভি দেখে, আমার খুব খারাপ লাগে। মাদার ইন্ডিয়া ছবিটা এই নিয়ে তিনবার দেখল। তিনবার দেখার মতো কী আছে?'

অন্তরা তার বাবার খাবার সময়ও কিছুক্ষণ সামনে বসে রইল। প্লেটে ভাত তুলে দিল। মফিজউদ্দিন সাহেব নিঃশব্দে খেয়ে গেলেন। এমনিতেই তিনি কথা কম বলেন, খাবার সময় একেবারেই বলেন না।

মফিজউদ্দিন খেয়েদেয়ে অন্য দিনের মতো রেস্ট নিতে গেলেন না। সরাসরি ছবি দেখতে গেলেন। অন্তরা টেলিফোন নিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে রোজ রাত ন'টার সময় সে টেলিফোন করে। টেলিফোনে এক ঘণ্টার মতো কথা হয়। এক ঘণ্টা কথায় অনেক কিছু চলে আসে। অন্তরা তার বাবার কাফনের কাপড় কেনার প্রসঙ্গ নিয়ে এল—

'এই জান আজ কী হয়েছে? ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'আমার বাবা অর্থাৎ তোমার শ্বশুর সাহেব ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড করেছেন।'

'কী কাণ্ড!'

'আন্দাজ কর তো, দেখি পার কি না।'

'আন্দাজ করতে পারছি না। উনি কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছেন?'

'উনি বলছ কেন?'

'উনি বলব না তো কী বলব?'

'বাবা বলবে।'

'এখনই বাবা বলব নাকি?'

'হ্যাঁ এখনই বাবা বলবে। আমি তো তোমার মাকে এখনই মা বলি।'

'কবে মা বললে?'

'ওমা এর মধ্যে ভুলে গেছ! কাল আমি জিজ্ঞেস করলাম না, মা কেমন আছেন। আমি কি বলেছি তোমার মা কেমন আছেন?'

'ও আচ্ছা। এখন মনে পড়েছে।'

'তোমার এমন ভুলোমন, কোন দিন আমাকে ভুলে যাবে! কে জানে হয়তো এখনই ভুলে যাবে। বল তো আমার নাম কী?'

'আসলেই তো ভুলে গেছি— তোমার নাম যেন কী?'

'ফাজলামি করবে না তো।'

'আচ্ছা যাও ফাজলামি করব না। তোমাদের বাসায় ভয়ঙ্কর ব্যাপার কী হল তা কিন্তু এখনো বল নি।'

'আমার বাবা কাফনের কাপড় কিনে নিয়ে এসেছেন।'

'সে কী! কার জন্যে?'

'কার জন্যে আবার, নিজের জন্যে।'

'বল কী! মাথা খারাপ নাকি?'

'নিজের শ্বশুর সম্পর্কে এসব কী বলছ, ছিঃ!'

'আই অ্যাম সরি। তবে অন্তরা শোন কাফনের কাপড় কিন্তু অনেকেই কেনে। আমার এক দূরসম্পর্কের নানা কিনেছিলেন। শেষে দেখা গেল—তাঁর সংসারের সবাই মারা গেছে তিনি শুধু বেঁচে আছেন। তাঁর আর মৃত্যু হচ্ছে না।'

'আসলে বাবা হচ্ছেন খুবই স্ট্রেঞ্জ মানুষ। তিনি নিজের মতো থাকেন। অফিস করেন। কোনো বিষয়ে তাঁর কোনো কমপ্লেইন নেই।'

'কাফনের কাপড় কিনে এনে কী বললেন?'

'কিছুই বলেন নি। তিনি নিজের মতো আছেন। এখন ছবি দেখছেন।'

'কার ছবি দেখছেন?'

'ভিসিআর-এ ছবি দেখছেন। বাবার এই একটা শখ—ছবি দেখা। এখন দেখছেন ঠাণ্ডি হাওয়া। তুমি ঠাণ্ডি হাওয়া দেখেছ?'

'না।'

'গানগুলি এত সুন্দর। শুনলে পাগল হয়ে যেতে হয়। আচ্ছা আমি তোমাকে ক্যাসেট পাঠিয়ে দেব।'

'পাঠিয়ে দিতে হবে না। আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।'

'খবরদার এই কাজ করবে না। বিয়ের আগে শ্বশুরবাড়িতে ঘোরাঘুরি আমার খুব অপছন্দ।'

'অপছন্দ হলেও এই কাজটা আমাকে করতে হবে। রাজকন্যাকে না দেখে আমি থাকতে পারছি না।'

'খবরদার ঢং করবে না। আচ্ছা তুমি এত ঢং কোথায় শিখেছ?'

'আমার ইচ্ছা করছে এখনই চলে আসি। আমি গোপনে এসে চুপ করে তোমার দরজায় টোকা দেব। তুমি দরজা খুলতেই ঝপাং।'

'ঝপাং মানে?'

'ঝপাং করে তোমার গায়ে লাফিয়ে পড়ব।'

'এই শোন তুমি কিন্তু কথাবার্তা—অসভ্য দিকে নিয়ে যাচ্ছ। এ রকম করলে আমি কিন্তু টেলিফোন রেখে দেব।'

'উঁহুঁ রাখতে পারবে না। কারণ আমাদের কথা হয়েছিল আমি একটা অসভ্য কথা বলতে পারি।'

'একটা বলে ফেলেছ আর পারবে না।'

'এখনো বলি নি।'

'আমি কিন্তু টেলিফোন রেখে দিচ্ছি। এই রাখলাম, ওয়ান, টু, থ্রি।'

অন্তরা টেলিফোন নামিয়ে রিংগার অফ করে দিল। ওপাশ থেকে টেলিফোন করে করে ক্লান্ত হোক। মজা বুঝুক। রাত বারটার পর অন্তরা নিজেই করবে। এর মধ্যে অসভ্য কথা বলার জন্যে বাবু সাহেবের যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে যাবে।

অন্তরা মাকে নিয়ে খেতে বসল। সাজ্জাদ বাসায় নেই। সে তার বন্ধুর বাড়িতে পড়াশোনা করতে গিয়েছে। পড়াশোনা শেষ করে রাতে সেখানেই থেকে যাবে। অন্তরা বলল, কাজের মেয়েটাকে বল তো মা বাবাকে এক কাপ চা দিয়ে আসুক। ছবি দেখার সময় চা খেতে ভালো লাগে।

রেহানা বললেন, তোর বাবার চা-কফি কিছুই লাগে না। কাপে করে গরম পানি দিয়ে আয়। চুকচুক করে গরম পানি খাবে আর ছবি দেখবে। ছবিও কিন্তু দেখে না। ঘটনা কী জিজ্ঞেস কর, বলতে পারবে না।

'কী যে তুমি বল! কেন বলতে পারবে না?'

'তাকিয়ে থাকার জন্যে তাকিয়ে থাকা।'

'তুমি বাবার ওপর রেগে আছ বলে এরকম কথা বলছ।'

'রাগের মতো কাজ করলে আমি রাগব না!'

'বাবা মোটেই রাগের মতো কাণ্ড করে নি। কাফনের কাপড় অনেকেই কেনে। আমার এক খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডের নানা কিনেছিলেন। তার পর কী হয়েছে শোন মা। তাঁর সংসারের সবাই একে একে মরে গেলেন। তিনি শুধু বেঁচে রইলেন। অমর হয়ে গেলেন। বাবার বেলাতেও বোধহয় এরকম হবে। দেখা যাবে বাবা বেঁচে আছেন। আমরা সবাই মরে ভূত হয়ে গেছি। হি-হি-হি।'

রেহানা মুখ কালো করে বললেন, হাসছিস কেন? হাসির কী হল?

'হাসি আসছে আমি করব কী? মাগো কী অদ্ভুত দৃশ্য বাবা কাফনের কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমরা সবাই মরে ভূত হয়ে বিভিন্ন গাছে বাস করছি। হি-হি-হি।'

'হাসি বন্ধ কর। বন্ধ কর বললাম।'

অন্তরা হাসি বন্ধ করতে পারল না। হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলল, মা, ভূত হয়ে আমি কিন্তু বগনভিলিয়া গাছটায় থাকব তুমি অন্য কোনো গাছ বেছে নাও। হি-হি-হি।

অন্তরার ইচ্ছা করছে ভূতবিষয়ক এই মজার ব্যাপারটা এক্ষুনি টেলিফোন করে আসল মানুষটাকে জানায়। তবে ইচ্ছা করলেও এই কাজটা সে এখন করবে না। রাত বারটার আগে অবশ্যই না। রাত বারটা পর্যন্ত বাবু সাহেব টেলিফোনে আঙুল টিপে টিপে ক্লান্ত হয়ে নিক। অসভ্য কথা বলার মজাটা টের পাক।

রেহানা ঘরের কাজ শেষ করে ঘুমাতে যাবার আগে ঘড়ির দিকে তাকালেন, দশটা বেজে এগার মিনিট। অন্তরার বাবা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠিক দশটায় সে দাঁত মেজে বিছানায় যায়। তার বিছানায় যাওয়া মানেই ঘুম। তখন ডাকলে 'উঁ' করে সাড়া দেয় ঠিকই, কিন্তু সেই সাড়া দেয়াটাও হয় ঘুমের মধ্যে। আশ্চর্য একটা মানুষ। সংসারে কী হচ্ছে কী না হচ্ছে কোনো খোঁজ নেই। ছেলেটা আজ বাসায় নেই এটাও তাঁর চোখে পড়ল না। চোখে পড়লেও অবিশ্যি কিছু হবে না। জিজ্ঞেস করবে না, সে কোথায়। বাসায় একটা বিয়ে হচ্ছে। জিনিসপত্র কেনাকাটা আছে। বিয়ের তারিখ ঠিক করা আছে—কোনোটার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। সে আছে নিজের মতো, মাস শেষে বেতনের টাকাটা তুলে দিলেই যেন সব দায়িত্ব শেষ। এরকম মানুষের আসলে সংসার করাই ঠিক না। এরা আসলে মানুষও না। ঘরের আসবাব। সংসারে এদের ভূমিকা ফার্নিচারের মতো। জায়গামতো ফার্নিচারটা বসিয়ে দাও। মাঝেমধ্যে ঝাড়া দিয়ে ঝেড়ে ধুলা উড়িয়ে দাও—সব ঠিক।

রেহানা পান মুখে দিয়ে অন্তরার ঘরের দিকে গেলেন। তাঁরও কথা বলার মানুষ নেই। মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা। সেই সুযোগও বেশি দিন পাওয়া যাচ্ছে না। বিয়ে হয়ে মেয়ে চলে যাচ্ছে।

রেহানা অন্তরার ঘরে ঢুকতেই অন্তরা বলল, মা আজ তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারব না। আজ যাও তো।

'কী করবি? টেলিফোন নিয়ে বসবি?'

'টেলিফোন নিয়ে বসব মানে, আমি কি সারাক্ষণ টেলিফোন নিয়ে থাকি?'

'যখনই তোর ঘরের সামনে দিয়ে যাই তখনই দেখি গুটুরগুটুর করছিস। বিয়ের আগে এত কথা বলে ফেললে বিয়ের পর কী বলবি?'

'আশ্চর্য কথা! তোমার ধারণা দেখে অবাক হচ্ছি মা। তুমি ভাবছ আমি ওর সঙ্গে কথা বলি? আমার এত কী দায় পড়েছে? আজ সে টেলিফোন করেছিল। আমি মুখের ওপর টেলিফোন রেখে দিয়ে রিংগার অফ করে দিয়েছি যাতে টেলিফোন করলেও আমাকে ধরতে না হয়।'

'সে কী! কেন?'

'আমার কথা বলতে ইচ্ছা করে না এই জন্যে।'

'এটা তো ঠিক না, মুখের ওপর টেলিফোন রেখে দিবি কেন?'

'কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক না তা নিয়ে তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে না মা। প্লিজ তুমি এখন যাও। তোমাকে অসহ্য লাগছে।'

'কেন, আমি কী করলাম?'

'তুমি কী করলে আমি জানি না। আমি শুধু জানি—এ বাড়ির সবাইকে আমার অসহ্য লাগছে।'

রেহানা মুখ কালো করে মেয়ের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। নিজের শোবার ঘরে ঢুকে চমকে গেলেন। কারণ, অন্তরার বাবা এখনো জেগে আছে। তারচেয়ে বড় কথা তাঁর সামনে কাফনের কাপড় বিছানো। কাপড়টা প্যাকেট থেকে বের করা হয়েছে। রেহানা বললেন, জেগে আছ কেন?

মফিজউদ্দিন বিড়বিড় করে বললেন, ঘুম আসছে না।

'সামনে কাপড় নিয়ে বসে আছ কেন?'

'মেপে দেখলাম। মনে হচ্ছে কাপড় একটু শর্ট পড়বে।'

'মাপলে কীভাবে? বাজার থেকে গজফিতাও নিয়ে এসেছ?'

'হাত দিয়ে মাপলাম। তিন হাত হচ্ছে এক গজ।'

রেহানা স্বামীর সামনে বসতে বসতে বললেন, তোমার কী হয়েছে ঠিকমতো বল তো।

'কিছু হয় নাই।'

'অবশ্যই হয়েছে। তোমার চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা হয়েছে। কাফনের কাপড় কেন কিনলে বল?'

'কাজ আগিয়ে রাখলাম। যেদিন মারা যাব সেদিন যদি হরতাল থাকে দোকানপাট থাকবে বন্ধ।'

'কবরের গর্তও খুঁড়িয়ে রাখ। হরতালের দিন কবর খোদার লোক যদি না পাওয়া যায়!'

মফিজউদ্দিন কিছু বললেন না। রেহানা বললেন, আস ঘুমাতে আস। আর খবরদার তুমি এই কাপড়ে হাত দেবে না।

'আচ্ছা।'

'এই কাপড়ের প্রসঙ্গ মুখেও আনবে না।'

'আচ্ছা।'

রেহানা স্বামীকে নিয়ে ঘুমাতে গেলেন। ইচ্ছা করে আজ ঘনিষ্ঠ হলেন। স্বামীর গায়ে হাত রেখে আদুরে গলায় বললেন—এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ এরকম তো কখনো হয় না। বিশেষ কিছুর প্রয়োজন থাকলে বল। লজ্জা করার দরকার নেই। কিছু লাগবে?

'না।'

'আচ্ছা বেশ ঘুমাবার আগে পাঁচ–দশ মিনিট গল্প কর। নাকি তাও করবে না?'

'কী গল্প?'

'যা ইচ্ছা বল। আজকে যে ছবিটা দেখলে সেই গল্প বলতে পার। অফিসের গল্প বলতে পার। তোমাদের অফিসে মজার কিছু হয় না?'

'না।'

'কোনো গল্প করতে ইচ্ছা করছে না?'

মফিজউদ্দিন ক্ষীণ স্বরে বললেন, একটা গল্প করতে ইচ্ছা করছে কিন্তু তুমি রাগ করবে।

'না রাগ করব না, বল।'

'কাফনের কাপড় নিয়ে গল্প। পুরুষদের কাফনের কাপড় লাগে তিনটা। এদের আলাদা আলাদা নাম আছে। একটা হল পিরহান। ঘাড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। আরেকটাকে বলে ইজার। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইজার দিয়ে ঢাকা হয়। আরেকটাকে বলে লেফাফা। এটা ইজারের মতোই। শুনছ?'

'হ্যাঁ শুনছি।'

'মেয়েদের কাপড় লাগে পাঁচটা। পিরহান, ইজার, লেফাফা তো আছেই, তার ওপর বাড়তি হল—ছের বন্দ। ছের বন্দ দিয়ে মাথার চুল জড়িয়ে দিতে হয়। আর হল সিনা বন্দ। সিনা বন্দ দিয়ে বুক থেকে উরু পর্যন্ত ঢাকা হয়।'

রেহানা থমথমে গলায় বললেন, আরো কিছু বলবে? মফিজউদ্দিন বললেন, কাফনের কাপড়ের আরেকটা মজার ব্যাপার আছে। হিজড়াদের মেয়েদের মতো কাফনের কাপড় পরাতে হয়। ওদেরও পাঁচ টুকরা কাপড় লাগে।

'ও।'

'আর পুরুষত্ব নেই পুরুষ, যারা নপুংসক তাদের জন্যেও পাঁচটা কাপড় লাগে।'

'যথেষ্ট কথা বলেছ। আর না এখন ঘুমাতে যাও।'

'ঘুম আসছে না।'

'ঘুম না আসলে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি কর। কিংবা ছবি দেখ। অন্তরাকে বল ভিসিআর ছেড়ে দেবে।'

'ভিসিআর আমি নিজেই ছাড়তে পারি।'

'তা হলে তো ভালোই।'

মফিজউদ্দিন বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। রেহানাও নামলেন—তাঁর মাথা চড়ে গেছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হবে। ঘুমের ওষুধ খেলেও হয়তো ঘুম হবে না।

রাত বারটা বাজে। অন্তরা টেলিফোন করল। একটা রিং হতেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলল। অন্তরা বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

'ঘুমাব মানে? তুমি এমন খট করে টেলিফোন রেখে দিলে।'

'তুমি অসভ্য কথা বলবে আর আমি টেলিফোন ধরে থাকব। আমি এরকম মেয়েই না। এই শোন আমার না মনটা খুব খারাপ।'

'কেন?'

'মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি এই জন্যে মন খারাপ।'

'খারাপ ব্যবহার করেছ কেন? উনি কী করেছিলেন?'

'আমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিল।'

'গল্প করতে এলে খারাপ ব্যবহার করবে কেন?'

'মাকে তো তুমি চেন না। মা বিরাট গল্পবাজ। একবার গল্প শুরু করলে আর থামবে না। গল্প করেই যাবে।'

'তাতে অসুবিধা কী? তুমি গল্প করতে।'

'মার সঙ্গে গল্প করলে আমি তোমার সঙ্গে কখন গল্প করব? এখন একটা কথা আমার বলতে ইচ্ছা করছে কিন্তু বললে তুমি মাথায় উঠে যাবে। এই জন্যে বলব না।'

'প্লিজ বল।'

'কথাটা হচ্ছে—তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না।'

'মিথ্যা কথা।'

অন্তরা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে না?

ওপাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে বলা হল, বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করব না কেন?

'তা হলে কেন বললে—মিথ্যা কথা।'

'এমনি বললাম, মজা করার জন্যে বললাম।'

'খবরদার আর বলবে না।'

'আচ্ছা যাও আর বলব না।'

'প্রমিজ!'

'প্রমিজ।'

'একটু ধর তো এক মিনিট।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'বসার ঘরে ভিসিআর চলছে। দেখে আসি কী ব্যাপার।'

'এত রাতে কে ছবি দেখছে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না, তুমি ধর তো।'

অন্তরা বসার ঘরে ঢুকল। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল। মফিজউদ্দিন সাহেব ভিসিআর দেখছেন। তাঁর গায়ে কাফনের কাপড়। তিনি শুয়ে আছেন লম্বা হয়ে। মাথার নিচে বালিশ দেয়া যাতে ভিসিআর দেখতে অসুবিধা না হয়। অন্তরা কাঁপা গলায় ডাকল, বাবা!

মফিজউদ্দিন মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়েই টিভি পরদার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

অন্তরা বলল, তুমি কী পরে আছ বাবা?

মফিজউদ্দিন টিভি পরদা থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললেন—কাপড়টা পরে দেখলাম ফিটিং হয় কি না। ভালো ফিটিং হয়েছে।

অন্তরা সারা বাড়ি কাঁপিয়ে বিকট চিৎকার দিল। গলা ফাটিয়ে ডাকল, মা...মা...।

মফিজউদ্দিন সাহেবের তাতে কোনো ভাবান্তর হল না।

কাফনে মোড়া একজন মানুষ, শুধু মুখটা বের হয়ে আছে। চোখ খোলা। সেই চোখ তাকিয়ে আছে টিভি পরদার দিকে। টিভি পরদার আলো এসে চোখে পড়েছে। তাঁর চোখ চকচক করছে।